بسم الله الرحمن الرحيم

হেদায়াতের ইমামগণ

"এই ইলমকে বহন করবে প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্য থেকে একদল ন্যায়পরায়ণ লোক। তারা তা হতে অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার ও মুর্খদের অপব্যাখ্যা দূরীভূত করবে।" রাসূল ﷺ-এর এই হাদিস থেকে দ্বীনের হেফাজতকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এই দ্বীনকে ধারণ করা শুধু পুথিবদ্ধ ইলম অর্জন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা ইলমের উদ্দেশ্য তো এই নয় যে, তা শুধুমাত্র জানা থাকবে, বরং ইলমের মূল উদ্দেশ্য হলো তদনুযায়ী আমল করা। যাতে এই ইলমের ফায়দা হাসিল হয়।

আল-কুরআনের ঐশী বিধি-নিষেধগুলো কার্যক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয় না যতক্ষণ না মানুষ সেগুলো বাস্তবায়ন করে। নিশ্চয়ই এই দ্বীন আমলের দ্বীন। আল্লাহ ﷻ বলেন: {তুমি বলে দাও, 'তোমরা কাজ করতে থাক। অচিরেই আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন এবং তাঁর রসূল ও মুমিনগণও দেখবে।'} [আত-তাওবাহ:১০৫]। একারণে যারা শুধু মুখে কথার ফুলঝুরি ছোটায় কিন্তু আমল করে না, আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করেন। তিনি ﷻ বলেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়} [আস-সাফ:২-৩]....'আব্বাদ ইবনে আব্বাদ আল-খাওয়াস আশ-শামী বলেন, "নিশ্চয়ই আল-কিতাব(কুরআন) ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মাধ্যমে কথা বলা হয়। এবং সুন্নাহ নিজে বাস্তবায়িত হয় না, যতক্ষণ না তার উপর আমল করা হয়।... এবং আল্লাহ ﷻ বলেন, {আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।} [আল-বাকারাহ:৬৩] অর্থাৎ তাতে যা আছে তার উপর আমল করো। এবং আমলে বাস্তবায়ন না

করে কেবল মুখে মুখে সুন্নাহ আদায়ের দাবি করো না। কেননা নি:সন্দেহে আমলে বাস্তবায়ন না করে সুন্নাহ আদায়ের দাবি করা একটি মিথ্যা দাবি এবং ইলমের অপচয়। [সুনান আদ-দারিমি]

আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন শুধুমাত্র এমন লোকদের দ্বারাই সম্ভব যারা নিজেদের জীবনকে শারীয়াহ মোতাবেক পরিচালনা করে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে; যাতে তাঁর শারীয়াহ গৌরব ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে কায়েম হয়। কেননা যদি ইসলামের কোনো রাষ্ট্র না থাকে, তাহলে ইসলাম ও এর বিধি-বিধানের কোনো মর্যাদা ও কার্যকারিতা থাকে না। এটিই নবী ﷺ ও তার সাহাবাদের আদর্শ। এবং এটিই দাওলাতুল ইসলামের শায়খদের বুঝ। তারা কেবল কুরআন শেখা ও শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি। বরং তারা মানুষের মাঝে কুরআনের বিধান ছড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তারা মর্যাদার বাহনে আরোহণ করলেন, আহত উম্মাহকে জাগ্রত করার জন্য।

তারাই সেই সকল লোক, যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কিতাব আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন পরিপূর্ণভাবে। তাদের একেকজন শুধু এক হাজার নয়, এক সম্পূর্ণ উম্মাহর ন্যায়। তাদের মজবুত কাঁধের উপর ভর করেই উম্মাহ খিলাফাহ লাভ করেছে; যে কাঁধগুলো এমন ভারী দায়িত্ব বহন করেছে, যা বহন করতে সুদৃঢ় পাহাড়ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল।

শাইখ আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) দাওলাতুল ইসলামের প্রথম ইটটি স্থাপন করেছিলেন। তিনি মুজাহিদদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আক্বিদার উপর ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। আর তার সাথে ছিলেন সত্যবাদী মাশায়েখ ও ধৈর্যশীল আমীরগণ।

এরপর আসেন শাইখ আবু উমর আল-বাগদাদী ও শাইখ আবু হামযাহ আল-মুহাজির (আল্লাহ তাঁদের দুজনকে কবুল করুন)। তারা দাওলাতুল ইসলাম, এর মন্ত্রণালয়সমূহ ও এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের শাসনামলে শরীয়াহ-ই প্রভাব বিস্তার ও শাসন করত। অতঃপর একসময় মুরতাদ সাহাওয়াতদের ফিতনায় দাওলাতুল ইসলাম পিছু হটে।

এরপর আসেন কারাপ্রাচীরসমূহ গুড়িয়ে দেওয়া শাইখ আবু বকর আল- বাগদাদী, ইব্রাহিম ইবনে আওয়াদ আল-বাদরি(আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)। উম্মাহর জন্য তিনি ছিলেন পূর্ণিমার চাঁদস্বরুপ। তিনি যে অবস্থায় ইরাকের দাওলাতুল ইসলামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, সেটি ছিল ছিল একজন আমীরের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সবচেয়ে প্রতিকূল সময়। এমন এক কঠিন ও ফিতনাময় সময়, যা সামাল দিতে পারে কেবল দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী নিষ্ঠাবান লোকেরা। তিনিই ছিলেন দুই নদীর ভূমিতে (ইরাক)

জিহাদের নৌকার শ্রেষ্ঠ নাবিক। অতঃপর তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করলেন এবং বিপত্তির উৎসগুলোতে আক্রমণ করলেন ও সেগুলো দূর করলেন। তিনি ফিতনা রুখে দিলেন ও সেগুলোর অবসান ঘটালেন এবং তার সত্যবাদী সৈনিকদের নিয়ে কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখলেন।

অতঃপর এ জিহাদ শামেও সম্প্রসারিত হলো। সেখানে ছিল কিছু বাতিলপন্থী হায়না। যারা জিহাদ করার দাবি করে তারপর এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে বিকৃতি সাধনের চেষ্টা করছিল। তারা তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করত না। এ ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহও ছিল না। শাসনকার্য তারা ছেড়ে দিয়েছিল তাদের সাংবিধানিক বিচারক ও উকিলদের জন্য।

অন্যদিকে আল্লাহ ﷻ শাইখ বাগদাদীকে এই উম্মাহর দ্বীন ও কুরবানী হিফাজত করার তাওফীক দান করলেন। তিনি তার নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রতি বিঘত ভূমি আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী শাসন করলেন। অতঃপর যখন দারুল ইসলামের পরিধি বৃদ্ধি পেল; পূর্ব-পশ্চিমের তাগুতদের প্রচণ্ড শত্রুতা সত্ত্বেও শাইখ ঘোষণা করলেন ‘খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’। অথচ এটি ছিল তার এবং তার সৈন্য ও প্রজাদের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন একটি পদক্ষেপ। কিন্তু এটিই ইসলাম ও মিল্লাতের মহান মুজাদ্দিদদের পথ, যারা আপন রবের পথে অটল থাকেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতঃপর পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে দলে দলে ও একাকী অবস্থায় যুবক-বৃদ্ধ, আরব-অনারব, সব ধরনের ইসলামের বীরেরা দারুল ইসলামে আসতে লাগল। আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত অন্বেষণকারীদের রাস্তা সহজ হয়ে গেল। এবং এমন এক চেতনা মানুষের মন-মেজাজে বিকশিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, যা বহু বছর ধরেই সেখানে সুপ্ত অবস্থায় ছিল।

এটি ছিল এমন এক পদক্ষেপ, যার ফলে এমন প্রত্যেক নেতা পিছু হটেছিল, যে তার পদ কিংবা উপার্জন খোয়ানোর আশঙ্কা করেছিল। এবং এটি শুধু শাইখ বাগদাদীকে সাহায্য করার মাধ্যমেই নয়; বরং তারা এই ভেবে অস্থির ছিল যে, যদি তারা তার সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকে, তাহলে কুফফারদের পক্ষ থেকে তাদের উপর কি কি আপতিত হবে আর আবর্জনারা কিভাবে তাদের ভৎসনা করবে। তাহলে তারা কিভাবে তার, কিংবা তার পায়ের তলার সমান মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে?

শাইখ বাগদাদী (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) দ্বীন ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা তাঁর ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ করি। তিনি এমনসব বিধানও প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে বিলুপ্ত ছিল। যেগুলো কেবল আদিম সব কিতাব আর গ্রন্থাগারেই পাওয়া যেত। যেমন- আল-

ক্বাসামা, দাসপ্রথা, জিযইয়া গ্রহণ, ইত্যাদি। এসব বিধানকে অনেক মানুষ ইসলামের বিধানই মনে করত না। আর আরেকদল তো বলত যে, এ বিধানগুলোর যুগ ফুরিয়ে গেছে, এ যুগে আর এসব চলবে না।

এদিকে প্রতারকদের মধ্যে যারা কিছু ভূমি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল, তারা নাস্তিকদের প্রচার-প্রচারণা, শিরকের প্রকাশ্য মহড়া, কিংবা রাফেদী গোষ্ঠী কর্তৃক উম্মাহাতুল মুমিনীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর(ﷺ) সাহাবাগণকে গালিগালাজ, কিছুই থামাতে পারেনি। বর্তমানে মানুষ জানে না বা অভ্যস্ত নয়, দ্বীনের এমন বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা করা তো দূরের কথা; তারা তাওহিদ ও এর সুস্পষ্ট নির্দশনগুলোই বাস্তবায়ন করেনি।

শাইখ বাগদাদী ও তার সহযোদ্ধাগণ মুসলিমদের সম্পদ জালিয়াতি ও প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। এরজন্য তিনি স্বর্ণ মুদ্রা তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যেন মুসলিমদের ধন-সম্পদ ও সম্মান-মর্যাদা রক্ষা হয় এবং তাদের ইহকালীন অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হয়। আর মুসলিমরা যাতে ক্রুশ-পূজারীদের মুখাপেক্ষী না হয় এবং তারা যাতে চুক্তি-স্বাক্ষরের মাধ্যমে মুসলিমদের দ্বীন ছিনিয়ে নিতে না পারে।

শাইখ বাগদাদী (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন) এমন এক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, ইতিহাসে যার আর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন একদিকে আর পুরো পৃথিবী তার বিরুদ্ধে ছিল আরেকদিকে। কিন্তু এতে তার মুমিনদেরকে লড়াইয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানই বৃদ্ধি পেল। এবং তিনি আরও অধিক পরিমাণে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিআল্লাহু আনহুমাদের উত্তরসূরীদের জাগ্রত করতে লাগলেন। যাতে তারা কাফির জাতিসমূহকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাদের কৃত অপরাধগুলোর প্রতিদান হিসেবে তাদের নিজেদের ভূমিতেই বশিভূত করেন।

তিনি উম্মাহকে ফিকহ, আল্লাহর দাসত্ব ও সর্বাবস্থায় তাঁর আদেশ পালনের এক সবক শিখিয়ে গেছেন; যেদিন তিনি বলেছিলেন: ‘‘নি:সন্দেহে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন, বিজয় অর্জনের আদেশ দেন নি।’’ যেন উম্মাহ বুঝতে পারে, জিহাদ করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করাই একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। এর জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অবস্থান বা ফলাফল আসার শর্তারোপ ছাড়াই।

হকের পথকে বাতিলপন্থীদের ব্যার্থ চাটুকারিতা ও চুক্তি- সন্ধির দ্বারা কলুষিত হওয়া কিংবা মূর্খ

বাড়াবাড়িকারীদের দ্বারা বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহর পর দাওলাতুল খিলাফাহর (আল্লাহ একে সমুন্নিত করুন) মাশায়েখ ও আমীরদের অবদান অনস্বীকার্য। এটি না ঘটলে এ উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেক কুরবানী বিফলে যেত।

আমরা তাদেরকে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি, যাদের সম্পর্কে নবি ﷺ বলেছেন: ‘‘আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে একদল লোককে সম্মানিত করেন, আর আরেকদল লোককে অপদস্থ করেন।’’ অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাদেরকে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়েছেন। তাদেরকে বানিয়েছেন হেদায়েতের দিশারী ও অন্ধকার রাতের আলো।

অতঃপর শাইখ বাগদাদীও চলে গেলেন এবং তার পরে জিহাদের ঝান্ডা দিয়ে গেলেন আমিরুল মুমিনীন, সম্মানিত মুজাহিদ শাইখ আবু ইব্রাহিম আল হাশেমি আল কুরাইশীকে(আল্লাহ তাঁকে হিফাজত করুন)। যাতে উম্মাহ আমানত ও সততার বাতিঘরসমূহের উপর টিকে থাকে। যারা দ্বীন ও মিল্লাতের নিদর্শনসমূহকে সংরক্ষণ করবেন এবং যাদের হাত ধরে জিহাদ চালতে থাকবে খুলাফায়ে রাশেদীন রাদ্বিআল্লাহু আনহুমদের পদচিহ্ন অনুসরণে। আবু বকর আস-সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে আল-ফারুক্ব উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে অসিয়ত করেছিলেন, যেন তিনি মানুষকে মুসান্না ইবনে হারেসার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘উমর আমি তোমাকে যা বলছি তা মনোযোগ দিয়ে শুন এবং তারপর তা বাস্তবায়ন কর। আমি আশংকা করছি যে, আজকেই আমার মৃত্যু হবে। যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই তুমি লোকদেরকে মুসান্নার সঙ্গে লড়াইয়ে বের হওয়ার জন্য সমবেত করবে। বিপদ যত বড়ই হোক, তা যেন তোমাদেরকে তোমাদের রবের আদেশ ও দ্বীনের বিধান পালনে বাঁধাগ্রস্ত না করে। তুমি তো দেখেছো রাসূলুল্লাহর(ﷺ) মৃত্যুর সময় আমি কী করেছি। আর সৃষ্টিজীবের উপর কখনো এর মতো কোনো বিপদ আপতিত হয়নি।’’

এ সকল মহান নেতৃবৃন্দের মতো মানুষদের মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহ তার মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য এ উম্মাহর সন্তানদের শক্তি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য কুরবানীর মর্যাদাপূর্ণ পথে এ উম্মাহ আরোহণ করতে থাকবে। অত:পর উম্মাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। এবং পরিশেষে সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের মহামহীম রব আল্লাহর জন্য।